বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী : উদয়ের পথে প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার এক চিলতে আলো

নাহিদা আশরাফী

দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
কারো দামে পাওয়া নয়
দাম দিসি প্রাণ লক্ষ-কোটি
জানা আছে জগৎময়

দাম দিয়ে কেনা এই স্বাধীন ভূখণ্ডটি পঞ্চাশ উত্তীর্ণ করল। স্বভাবতই একটু আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা। কিন্তু সেখানে আমাদের মানতে হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব, সঙ্গনিরোধ, বিচ্ছিন্ন থাকা আরও কত কী! বাধ্য হচ্ছি ঘরে থাকতে। দীর্ঘ লকডাউন শেষে জীবনযাপনের প্রয়োজনে বিশ্ব যখন কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, বাংলাদেশেও খুলতে শুরু করেছে কলকারখানা, অফিস-আদালত ঠিক তখনই জীবনযাপনে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল। অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয়। স্কুল-কলেজ খুলছে না। মানুষের মাঝে হতাশা ও নৈরাশ্য বাড়ছে। আর এসব ক্ষেত্রে অপরাধ ও সামাজিক অবক্ষয় বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবজাতি এত ভয়াবহ সংকটে আর পড়েছে কি? মনে হয় না। নানা মহামারিতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হলেও পৃথিবীজুড়ে এমন শঙ্কা, অনিশ্চয়তা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। পৃথিবী আগে কখনো এতটা থেমে যায়নি। অবরুদ্ধ জীবনকে সঙ্গী করেই আমরা আশায় বুক বাঁধি। বিশ্বাস করি পৃথিবীতে কোনো দুর্যোগই স্থায়ী নয়। হয়তো অচিরেই এর সমাধান শোনা যাবে। মানুষকে ইতোমধ্যে ভ্যাক্সিন দেয়া শুরু হয়েছে। তবু এ অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে রেহাই পেতে সময় তো লাগবেই।

হয়তো স্মৃতিসৌধে এবার বিশাল জমায়েত হবে না। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা জানাতে ১৪ ডিসেম্বর ঢল নামবে না রায়ের বাজারেও। তবে অন্তরের শ্রদ্ধা আটকায় কে? ভালোবাসা দিয়েই আমরা সম্মান জানাব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, সূর্যসন্তানদের প্রতি। 'মুজিব চিরন্তন' এই শিরোনামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের উদ্দেশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সফর করছেন। গত ১৭ মার্চ বাংলাদেশে এসেছিলেন

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সালেহ; ১৯ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেছেন শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহেন্দ্র রাজাপাকসে, বাংলাদেশ সফর করেছেন নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী, ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ড. লোটে শেরিং এবং সর্বশেষ ২৬ মার্চ বাংলাদেশ সফরে এসেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ভিডিয়ো বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইউশিহিদে সুগা ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আরব আমিরাতে দুবাইয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন বুর্জ আল খলিফায় আট ঘণ্টাব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রদর্শন ও আলোকসজ্জারও আয়োজন করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পাঠানো ভিডিয়ো বার্তায় পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভাষা নিয়ে সহবস্থানে এক আধুনিক নাগরিকের দেশ বাংলাদেশ, যার আরেকটি পরিচয় সোনার বাংলা। এই সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাই এই পঞ্চাশে প্রাপ্তি, প্রত্যাশা, চাওয়া-পাওয়া আর আজকের এই দেশমাতৃকাকে নিয়ে তার সন্তানদের চুলচেরা বিচার করবার কোনো সূচক যেহেতু তৈরি হয়নি, তাই কিছু তুল্যমূল্য বিচারে আমরা একটু পেছন ফিরে আজ অবধি তার অবস্থান নিয়ে একটা ধারণা নিতে পারি মাত্র। একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে তার সামাজিক অবস্থা, আর্থিক অবকাঠামো, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, বিচারব্যবস্থার যথার্থ প্রয়োগ, জীবনমান, মূল্যবোধের চর্চা এসব কিছুর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণের উপরে। তবে অর্ধশতাব্দীর এই পথ পাড়ি দেওয়া বাংলাদেশকে দেখার আগে একটু পেছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন মনে করছি।

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল— ১৯০ বছরের অবিভক্ত ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু-টি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলায় (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত শোষণ ও রাজনৈতিক কূটকৌশল-এর কারণই বলতে গেলে স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট রচনার মূল কারণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দেলন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ ও এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি ঘোষণা এবং পূর্ব বাংলায় ছয় দফার জনপ্রিয়তায় ভীতসন্ত্রস্ত পশ্চিমা শাসকদের ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট পঁয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের— এ সবই ক্রমাগত এক বিদ্রোহী স্রোতের মতো পূর্ব বাংলাকে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড সৃষ্টির পেছনে কাজ করে গেছে। জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে তথাকথিত ষড়যন্ত্র

মামলাটি প্রত্যাহার করে পরবর্তী কালে বঙ্গবন্ধু-সহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তি প্রদানে বাধ্য হয় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামি লীগের দলীয় সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। দুশো একান্ন জন এমএনএ ও দুশো সাতষট্টি জন এমপিএকে শপথবাক্য পাঠ করান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরে তিনি এক নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন :

> কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা পঁচাশি জন, আমরা পনেরো জন। সামরিক বিভাগে তোমরা নব্বই জন, আমাদের দিয়েছ দশ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করছ আশি ভাগ, আমাদের দিয়েছ কুড়ি ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার দশ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রইল। রিলিফ কাজের জন্য বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেল, অথচ ঢাকায় একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোনো হেলিকপ্টার এল না। আমরা এসব বে-ইনসাফির অবসান করব।

কিন্তু ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে শুরু করে টালবাহানা। ১৯৭১ সালের মার্চের ১ তারিখে দুপুর একটা পনেরো মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বক্তব্যে ক্ষোভ ও বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকা নগরী। এদিন হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামি লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছিল। ঢাকা স্টেডিয়ামে চলছিল বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যে ক্রিকেট খেলা। রেডিয়োতে এই খবর শুনে খেলা ফেলে দলে দলে বিক্ষুব্ধ জনতা হোটেল পূর্বাণীর সামনে এসে সমবেত হয় এবং স্লোগানে স্লোগানে চারদিক প্রকম্পিত করে তোলে। বঙ্গবন্ধু হোটেলের সামনে এসে সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন :

> অধিবেশন বন্ধ করার ঘোষণায় সারা দেশের জনগণ ক্ষুব্ধ। আমি মর্মাহত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আমি সংগ্রাম করে এ পর্যন্ত এসেছি। সংগ্রাম করেই মুক্তি আনব। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ২ মার্চ ঢাকা শহরে এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এরপর আসে বাঙালির ইতিহাসের পরমাকাঙ্ক্ষিত সেই ৭ মার্চ। দিনটি ছিল রবিবার। সংগ্রামী বাংলা সেদিন অগ্নিগর্ভ, দুর্বিনীত। বঙ্গবন্ধু যখন 'ভাইয়েরা আমার' বলে বক্তৃতা শুরু করেন জনসমুদ্র পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যায়। সেদিন নেতার বক্তৃতার শেষাংশ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম

স্বাধীনতার সংগ্রাম' বস্তুত এটাই ছিল বীর বাঙালির জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা, এক মহাকাব্যিক শানিত কবিতা। কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর কবিতায় এ দিনটির কথা উল্লেখ করেছেন সেভাবে— 'একটি কবিতা লেখা হবে/ তার জন্যে অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে/ লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী স্রোতা বসে আছে/ ভোর থেকে জনসমুদ্রের উত্তাল সৈকতে:/ কখন আসবে কবি? ... শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,/ রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে/ অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।/ তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,/ হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার/ সকল দুয়ার খোলা/ কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?/ গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:/ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"/ সেই থেকে "স্বাধীনতা" শব্দটি আমাদের।'

হ্যাঁ, সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি তো আমাদের হল। কিন্তু এই প্রাপ্তি রক্ষা করা যে কতটা কঠিন ছিল তখন, তা কি একবারও আমরা ভেবে দেখেছি? আমাদের আরাধ্য স্বাধীনতাকে, আমাদের ইচ্ছে বা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা কি সত্যিই খুব সহজ ছিল? যে সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তার বাস্তবায়ন ছিল বিপদসংকুল, বাধাবিপত্তিতে ভরা ও কন্টকাকীর্ণ। একটি যুদ্ধোত্তর দেশ যার সমস্ত ভৌত অবকাঠামো ধ্বংসপ্রায়, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অপ্রতুল, বৈদেশিক সহায়তা নেই বললেই চলে, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোও এই ভয়াবহ খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ আর প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে দিশেহারা, সহায়সম্বলহীন কোটি শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের চ্যালেঞ্জ, সম্পূর্ণ অসংগঠিত একটি প্রশাসন ও দল নিয়ে কাজ করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। একে একে তিনি নিজ কাঁধে সব পুনর্গঠনের দায়িত্ব তুলে নিলেন। তাঁর কণ্ঠে তখন একটা কথার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে।

> এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।

বঙ্গবন্ধু এই যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এরই মাঝে তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠতে শুরু করেছিল যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ। সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত একটি দেশকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে উন্মোচিত করেন সম্ভাবনার নতুন দ্বার। বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। শিল্পে, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে জাতির পিতার সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশ যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এক কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হলেন তিনি। ১৯৭৫ সালের

১৫ অগাস্ট তাঁকে সপরিবারে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে অত্যন্ত নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলে তার সম্ভাবনাময় স্বর্ণযুগের উত্থান। সে রাতে শেখ মুজিব, শেখ কামাল, শেখ নাসের, বেগ মুজিব, সুলতানা কামাল, শেখ জামাল, রোজী জামাল, শিশু রাসেল-সহ নিহত হন আরও বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন। বঙ্গবন্ধুকন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাইরে থাকায় নির্মম এ হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং আওয়ামি লীগের হাল ধরে একে পুনর্গঠিত করেন। ১৯৯৬ সালে জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করলে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক কার্যকলাপে জনজীবনে নেমে আসে চরম ভোগান্তি ও অসহিষ্ণুতা। ফলশ্রুতিতে ২০০৯, ২০১৪ ও ২০১৯ সালের নির্বাচনগুলোতে পরপর তিনবার নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশের বাংলাদেশ আওয়ামি লীগ। এবং এক নাগাড়ে তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ প্রবেশ করে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের এক মহাসড়কে। দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে একসময় বলেছিল, 'তলাবিহীন ঝুড়ি'। মাত্র পঞ্চাশ বছরে সেই ঝুড়িতে সাফল্য খুঁজতে নেমে তল পাচ্ছে না পশ্চিমাবিশ্ব। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রিজার্ভ চুয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার।

দূরদর্শী, সুদক্ষ, সৃজনশীল ও সাহসী নেতৃত্বই যে একটি দেশকে বিশ্বের ইতিহাসে উন্নয়নের রোল মডেল ও সম্ভাবনার অপার বিস্ময়কর একটি অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত করতে পারে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েছিলেন; সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁরই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। কিছু উদাহরণ বিষয়টি আরও দৃশ্যমান করবে বলে ধারণা করছি—

১। বাংলাদেশ এখন দ্রুত উন্নয়নশীল প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি। আমাদের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ মানদণ্ডের চেয়ে প্রায় ১ দশমিক ৭ গুণ বেশি। মানবসম্পদ সূচকে নির্ধারিত মানদণ্ড ৬৬-এর বিপরীতে বাংলাদেশের অর্জন ৭৫.৪। সোয়া পাঁচ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে।

২। অনেক ত্যাগ আর রক্তস্রোতে কেনা স্বাধীনতা পঁচাত্তরে ফের লুণ্ঠিত হলে সামরিক সবজান্তারা কিছু নামসর্বস্ব কলেজকে সরকারি করলেও শিক্ষার বৈষম্য ও মৌলিকত্ব কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি। জাতির পিতার বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন ধূসর হয়ে ওঠে। সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠে শিক্ষা খাতে বেশ কিছু দৃশ্যমান সাফল্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা, একটি

পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার-সহ সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও নারীশিক্ষার বহুল প্রচার-সহ বেশ কিছু কাজ নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মতো। অর্থমন্ত্রীর উত্থাপিত বাজেটে ২০২০-২১ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮৭ হাজার ৬২০ কোটি টাকা।

৩। গত বছরের ১২ মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১। এটি উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। এটি বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্য দিয়ে সাতান্নতম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অবস্থান করে নিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রচার সেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বা ট্রান্সমিশন টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যেন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ব্যাহত না হয় এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও এই স্যাটেলাইটের আওতায় আনার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে এই উপগ্রহ।

৪। একশো তেইশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের ৯৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ২১,৬২৯ হাজার মেগাওয়াট। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বের দশম দেশ হিসেবে কয়লাভিত্তিক আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ করেছে। পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৩২০ মেগাওয়াট।

৫। পাঁচটি মোবাইল ফোন গ্রাহক, ৯ কোটিরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, ফোর জি মোবাইল প্রযুক্তি চালু, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট, অনলাইনে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ই-টেন্ডার প্রবর্তন, ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র, ই-কমার্স প্রভৃতির মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ আর স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তব।

৬। ২০০৯ সালে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য হেগের সালিশি আদালতে নোটিশ করলে ২০১২ সালে মিয়ানমার ও ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার রায় পায়। এতে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের রাষ্ট্রীয় সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল মহীসোপান এলাকায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বাংলাদেশ।

৭। শত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেতুটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অবকাঠামোগত প্রকল্প। চার-লেন, ছয়-লেন ও আট-লেন জাতীয় মহাসড়ক, উড়াল সেতু, মেট্রোরেল,

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেরিন ড্রাইভ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণের মাধ্যমে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনায় কক্সবাজারের মহেশখালির মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রে বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ২০১৬ সালের ২৬ জুন দেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের আগেই মেট্রোরেলে যাতায়াত করতে পারবে রাজধানীবাসী। চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গে আনোয়ারাকে যুক্ত করতে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে তৈরি হচ্ছে সাড়ে তিন কিলোমিটারের বঙ্গবন্ধু টানেল।

৮। ভারতের সঙ্গে ৬৮ বছরের অমীমাংসিত স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলের মানুষ অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে। একশো এগারোটি ছিটমহলের ১৭ হাজার ৮৫১ একর জায়গা বাংলাদেশের সীমানায় যুক্ত হয়েছে। সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

৯। ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজও এগিয়ে চলছে। এছাড়াও জলবায়ুর ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জনের জন্য 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' নামের শতবর্ষের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১-এর সফল বাস্তবায়নের পর রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে।

১০। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা বিশ্বব্যাপী প্রশংসনীয় ও অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে চলমান কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বিশ্বের অনেক দেশের কাছে রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত কম খরচে মৌলিক চিকিৎসার চাহিদা পূরণ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল, অসংক্রামক রোগসমূহের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধে ব্যাপক উদ্যোগ, পুষ্টি উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসূচক সমূহের অগ্রগতিতে বাংলাদেশ এগিয়েছে বহুদূরে।

১১। কৃষি খাত আগের তুলনায় অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত তরুণরা এখন যোগ দিচ্ছেন কৃষি বিপ্লবে। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নানামুখী সহায়তায় কৃষকরা

ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যার প্রভাব পড়ছে উৎপাদনে। এই উৎপাদন বিশ্ব পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার নানাভাবে প্রণোদনা দিচ্ছে। লবণাক্ত, খরা, জলমগ্নতা সহনশীল ও জিংকসমৃদ্ধ ধান-সহ একশো আটটি উচ্চফলনশীল জাত ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। যার কারণে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন চতুর্থ অবস্থানে। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ডিএই-এর আওতায় চলমান চব্বিশটি প্রকল্প কৃষি খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে বলেই ধারণা করা হয়। এছাড়া কৃষক ঋণ সহায়তা পাচ্ছে, সারের দামও কমানো হয়েছে। শুধু তাই নয় বিশ্বের মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ তৃতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, চাল উৎপাদনে চতুর্থ, আলু উৎপাদনে সপ্তম, আম উৎপাদনে নবম, খাদ্যশস্য উৎপাদনে দশম অবস্থানে রয়েছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার-সহ নানাধরনের পদক্ষেপ প্রশংসার দাবিদার।

শিরোনামে প্রাপ্তির সঙ্গে আমি প্রত্যাশা শব্দটি জুড়ে দিয়েছি। অপ্রাপ্তি কেন লিখিনি? এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা আপনারা দাবি করতেই পারেন। ভাবতে পারেন, অপ্রাপ্তি কি কিছুই নেই? উত্তরটা শেষেই দেব। তার আগে দেখুন, মুক্তিযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য আমাদের কী ছিল? এক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, দুই। অর্থনৈতিক মুক্তি। এ দু-টি ক্ষেত্রেই আমাদের সফলতা অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। বাইরের বৈষম্য নির্যাতন বা বঞ্চনা থেকে নিজেদের মুক্ত করেছি লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে। কিন্তু ভেতরের বৈষম্য, আভ্যন্তরীণ কোন্দল, হিংসাত্মক ও অমানবিক মনোবৃত্তি থেকে নিজেদের কি সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পেরেছি? আমাদের কথায়, শিল্পে, সাহিত্যে আমরা যা বলতে চাই তা কি বলতে পারছি অবলীলায়? আমরা ঝলমলে শহরের উজ্জ্বল সোডিয়াম বাতির নীচে জাতির মননের অন্ধকারটুকু রয়ে যাচ্ছে কিনা, তার খবর কি রাখছি? অবকাঠামোগতভাবে আমরা এগিয়েছি অনেক দূর। আধুনিক শিল্পায়িত দেশে পরিণত হয়েছি। আত্মার অবকাঠামো, মানুষের প্রতি মানুষের ভেদাভেদ ধর্মের বর্মে বিদ্ধ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করছি না তো? বিদ্যালয়ে বাতি জ্বললেই তো শিক্ষার আলো অন্তরে পৌঁছোয় না। অঙ্কে ও হারে বড়ো শোনালেও স্বাধীনতার পঞ্চাশে এসে একে কতটা প্রতুল মনে হয় তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে বটে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দুই-তৃতীয়াংশই যেখানে ব্যয় হয় শিক্ষক-কর্মচারীর বেতনে আর এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় শিক্ষার উন্নয়নে সেখানে শিক্ষার মান ও পরিবেশের বিকাশ যথাযথ না হবার সম্ভাবনাই প্রকট।

মসজিদ, মন্দির প্যাগোডার মেঝেতে মার্বেল পাথরে শীতলতা থাকলেই কি তা মানুষের আত্মিক শীতলতা তৈরি করতে পারবে? সেখান থেকে যদি ভুখালু ফিরে যায় ভুখা পেটে তাহলে তেমন হৃষ্টপুষ্ট পূজারী বা নধর দেহের ইমামকে শুনতেই হবে ...

আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করোনি প্রভু,
তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।

এই মুহূর্তে পুরো বিশ্ব এক ভয়ংকর জীবাণুর সঙ্গে মোকাবেলা করছে। এ সময়ে সব হিসেব মেলাবার আগে আমাদের বাঁচার হিসেব মেলাতে হবে। বিশাল ঘনত্বের এই দেশে এই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সচেতনতা এবং সতর্কতা যেমন জরুরি তেমনি জরুরি সরকারি ও বেসরকারি সহযোগী সংস্থার সার্বিক ও সরাসরি অংশগ্রহণ। এই উন্নয়ন যেন শুধু কাগজে হয়ে না যায় তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে সরকারকে। অর্থনীতির মৌলিক অবস্থা ভালো থাকা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকার পরও বাংলাদেশ কেন প্রতিবেশীদের চেয়ে কম বিদেশি বিনিয়োগ পাচ্ছে, সেই প্রশ্ন আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। কাজির গোরু খাতায় নয় গোয়ালে যেন থাকে সেই খতিয়ান খুব ঠান্ডা মাথায় মেলাতে হবে নইলে উন্নয়নের ওয়ান স্টপ সার্ভিস ফুলস্টপ সার্ভিসে বদলে যেতে সময় নেবে না। জাতি হিসেবে আমরা আমাদের ইতিহাস, লোকগাথা, ঐতিহ্য আর হাজার বছরের সমৃদ্ধ লোকাচার আর কৃষ্টি নিয়ে গর্বিত। ১৯১১ সালে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লি এলেন বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করতে। ভারতীয় নেতা গোখলেকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমরা তোমাদের রেলপথ, রাস্তাঘাট বানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হচ্ছ, তবু স্বাধীনতা চাও কেন?' গোখলের তৎক্ষণাৎ উত্তর ছিল, 'আমাদের আত্মমর্যাদা আছে বলেই স্বাধীন হতে চাই।' এবার বলি, সেই আত্মমর্যাদার কারণেই 'অপ্রাপ্তি' শব্দটি ব্যবহার করিনি। কারণ আজ যাকে অপ্রাপ্তি বলে ভাবছি হয়তো কিছু সময়ের ব্যবধানেই তা প্রাপ্তির খাতায় যোগ হবে। 'জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়' যে জাতি সে জাতি চাইলে পারে না এমন কোনো কিছু আছে বলে মানতে রাজি নই। তাই জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর আনন্দঘন ক্ষণে সর্বান্তঃকরণে একটিই কামনা ও প্রার্থনা, আরাধ্য স্বপ্নের বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার মহতী যাত্রা যেন অব্যাহত থাকে।